193

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 OCT 1993
পৃষ্ঠা 8 কলাম

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে যা করণীয়

আবদুল খালেক

ভারত সম্রাট হর্ষবর্ধন পৃথিবীর প্রাচীনতম নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্মীয় শিক্ষার লক্ষ্যে। বৌদ্ধ ধর্মের ওপর নেমে আসা বিপর্যয়ের কারণে পরবর্তীতে নালন্দা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। আজো নালন্দার পুনরুদ্ধারের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। সে যাই হোক; ১৭৮০ সালের পূর্বে ভারতবর্ষে শিক্ষা সরকারের দায়দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ঐ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে ভারতবর্ষে চমক লাগিয়ে দেয়। প্রাচীন ভারতে শিক্ষালয় হিসেবে বর্ণবাদী গুরুগৃহের প্রচলন ছিল। গুরুগৃহে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ধর্ম, দর্শন ও কামশাস্ত্র ছিল পাঠক্রমের বিষয়বস্তু। কালক্রমে মক্তব, মাদ্রাসা ও টোল শিক্ষালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। তাতে পাঠক্রমের তেমন সংস্কার হয়নি। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরা, বিশেষত বালিকা বৌ-রা, গৃহশিক্ষকের কাছে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ করতো। এইসব শিক্ষালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তদের রাজনৈতিক চেতনা বলতে কিছু ছিল না। অর্থনীতির সঙ্গেও শিক্ষার কোন সম্পর্ক ছিল না। কাজেই শাসকদের অবস্থান তারা বিপন্ন করে তুলবে এমন সম্ভাবনাও ছিল না। সেজন্যে ভারতবর্ষে স্বেচ্ছাচারী শাসন এত দীর্ঘস্থায়ী ছিল।

বৃটিশ আমলের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য ছিল শাসকদের অবস্থান দৃঢ় করার প্রয়োজনমাফিক পাঠক্রম-সম্বলিত স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শহরের বিত্তবান, ব্যবসায়ী ও অভি-জাতদের সন্তানদের ঔপনিবেশিক সরকারের কাজের উপযোগী করে তোলা। শাসকদের সহযোগিতায় খৃষ্টধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে মিশনারীরা উপজাতীয় অঞ্চলে ও নিম্নবর্ণ হিন্দু এলাকায় এবং এমনকি শহরেও শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করে। ধর্মীয় ও বর্ণবাদী সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় শিক্ষালয় ও ধর্মীয় ভাষার গদিচ্যুতি ঘটেনি বৃটিশ আমলেও। ইংরেজ বিদ্বেষের অজুহাতে মুসলমানরা ইংরেজী ভাষা শিখতে চায়নি। ফলে প্রশাসনে, শিক্ষালয়ে ও অন্যান্য পেশায় তাদের অবস্থান নগণ্য হয়ে পড়ে। মোঘল আমলের ফৌজি ভাষা উর্দুর সাহিত্যিক ও ব্যবহারিক প্রচলন বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে ও অভিজাত মুসলমান পরিবারে প্রসার লাভ করে। পাকিস্তান আমলে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মাধ্যমেই আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে উর্দুর পাশে দাঁড় করানো হয়েছিল। চার দশক পর আজো বাংলাদেশে বাংলা ভাষা উচ্চ আদালতের ভাষা হয়ে ওঠেনি। প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতেও বাংলার প্রচলন সীমিত বলা চলে। দেশের উচ্চশিক্ষায় নেই এর বাধ্যবাধকতা। প্রাইমারির প্রথম স্তর থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী ভাষা সনাতন দাপট নিয়েই গদিনসীন। এর প্রচন্ড আঘাতে ও পাঠক্রমের গুরুভারে কচিকাঁচারা নুয়ে পড়েছে। তিনটি ভাষার বোঝা কচি মনে শিক্ষা বিষয়ে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত গরীব ঘরের শিশুমনে। এইসব ঘরের শিশুদের বাড়িঘরে স্কুলের পাঠ শেখাবার কেউ নেই, নেই প্রাইভেট শিক্ষক নিয়োগের আর্থিক সামর্থ্য। এসব কারণে ও জীবিকা অর্জনের তাগিদে গরীবরা স্কুলে যেতে চায় না অথবা পারে না এবং গেলেও বেশিদিন টিকে থাকে না।

পরিবেশ, সুযোগ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির প্রয়ো-জনেও শিক্ষার ও শিক্ষার বিষয়বস্তুর প্রকারভেদ হতে দেখা গিয়েছে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে। তবে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার গৌরববোধে আঘাত হেনেছে ঔপনিবেশিক শাসকরা এবং তাদের ভাষার দাপট অথবা একচেটিয়া অবস্থান সৃষ্টি করেছে কলোনির ওপর। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, বাংলা ভাষার গৌরববোধে আমাদের কাঙ্ক্ষিত শিক্ষানীতি আজো প্রণীত হয়নি। সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, পাস ও সম্মান ডিগ্রীতে ইংরেজী হবে আবশ্যিক ভাষা, অথচ বাংলা ভাষার অনুরূপ আবশ্যিকতা নেই। শিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিতরা ইংরেজী ভাষায় সুদক্ষ হয়ে Anglo-Saxon-দের মত দেশে বিদেশে সমাদর পাবে তাতে আমাদের ঈর্ষার কারণ নেই। প্রশ্ন থেকে যায়, কিন্ডারগার্টেনের শিশুরা যেখানে চার-পাঁচ বছরে ইংরেজী শুদ্ধ করে বলতে ও লিখতে শেখে সেখানে অন্যান্য শিক্ষালয়ে বারো বছরের আবশ্যিক ইংরেজী পাঠক্রম উৎরিয়েও অনুরূপ ভাষাজ্ঞানও অর্জন সম্ভব হচ্ছে না কেন। অনুসন্ধানে জানা যাবে, শিক্ষকের ইংরেজী ভাষাজ্ঞানে ঘাটতি ও শিক্ষাদান পদ্ধতির ত্রুটির কারণেই এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আজকাল স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় লেটার ও ষ্টার মার্কের দীর্ঘ তালিকা দেখলে চোখ ঝলসে যায়। তাতে আমরা উল্লসিত এতসব মেধাবীর উদ্ভব দেখে। অল্প কয়েকদিন আগে প্রকাশিত এক খবরে দেখতে পেলাম, জনৈক কলেজ শিক্ষক তার কলেজের এক তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে প্রমোশনের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় চল্লিশজন তারকাখচিত শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র চারজন পাস করেছে। এরূপ ঘটনাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতির জন্যে দশ নম্বর বিপদ-সঙ্কেত বলা যেতে পারে। শিক্ষার ভিত্তিমূল প্রাইমারি শিক্ষা। প্রাইমারির ঘাটতি নিয়ে ক্রমোচ্চ পর্যায়ে প্রবেশ এবং সেই পর্যায়ের শিক্ষায় ঘাটতি নিয়েই বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে। তাই দশ বছরের বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজী পাঠের পর যখন ইংরেজীতে লেটারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা অনেকেই শুদ্ধ ইংরেজী বলতে ও লিখতে পারে না এই অভিযোগ আমরা শুনতে পাই তখন আমরা অবাকই হই।

শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলাদেশে পাঠক্রম কোথায় কিভাবে সুসম্পন্ন হচ্ছে কি হচ্ছে না তা তদারকির দায়িত্বে রয়েছে বিশাল প্রশাসনিক বিভাগ। শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হলো শিক্ষক। সুদক্ষ শিক্ষক, কার্যকর শিক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষালয়ের পরিচালনা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে শিক্ষার মান যা বর্তমানে বাংলাদেশে সর্বকালীন নিম্নস্তরে নেমে এসেছে বলে সর্বমহলের অভিযোগ। শিক্ষা বিষয়ক অভিযোগের সুদীর্ঘ ফিরিস্তি উপস্থাপন করা আমার লক্ষ্য নয়। তবু এটুকু না বললেই নয় যে প্রাইমারি থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত ম্যানেজিং কমিটি, গভর্নিং বডি, সিনেট, সিন্ডিকেট নামক প্রতিষ্ঠানগুলো ঠুটো জগন্নাথের ভূমিকায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের কার্যকারিতা প্রায় শূন্যের কোঠায়। শিক্ষালয়ের উচ্ছৃংখলতা, অনিয়ম অর্থাৎ দুর্নীতি এবং অন্যান্য অবৈধ ও অনৈতিক ক্রিয়াকর্ম বিমোচনে উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং শিক্ষা-লয়ের ভারপ্রাপ্তদের জবাবদিহিতার প্রশ্ন জাতির সামনে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কেউ তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে সফলতা অর্জন করেছেন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায় না, শিক্ষককে মারধর করে, শিক্ষক অপসারণের আন্দোলন করে, শিক্ষালয় ভাংচুর করে, পরীক্ষায় নকল করে, কথায় কথায় সাংবাদিক সম্মেলন করে, শিক্ষালয়ে সশস্ত্র আন্দোলন করে। এসব করার পর তারা স্বভাবত পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে ওঠে। কাজেই বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা কোথায় চলেছি, এটা উপলব্ধি করার প্রাথমিক দায়িত্ব অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদেরই। তবে আর যারা শিক্ষালয় পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন তাদেরকে হতে হবে দায়িত্ব পালনে সাহসী ও নিবেদিত।

এবার অন্য কথায় আসছি। আমরা কি ধরনের শিক্ষা চাই, কেন চাই এবং কিভাবে সেটা পেতে পারি এ বিষয়ে শিক্ষা কমিশন ও পন্ডিত ব্যক্তিগণ অনেক কথা বলেছেন। তাদের কথার পুনরুক্তি অপ্রয়োজনীয় বোধ করি। বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার ধারা ও নীতি কি রূপ নিয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার ইরাকীরা তাদের পণ্য বিক্রির হিসেব রাখার প্রয়োজনে বাড়িঘরেই শিক্ষালয় স্থাপন করেছিল। স্পার্টানরা প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িত থাকতো বলে 'পেশাজীবী সৈন্য-নাগরিক' তৈরিতেই তাদের মনোনিবেশ ছিল। এথেন্সবাসীদের যুদ্ধাশংকা তেমন ছিল না বলে তারা মনোযোগী হয় শিল্প-সাহিত্য, শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ বর্ধনে। মামলা-মোকদ্দমা পরি-চালনা নিজেদেরকেই করতে হতো বলে আইন শিক্ষায় তাদের একান্ত আগ্রহ ছিল। রোমে আইনের গুরুত্ব বেশি থাকার কারণে ছোটবেলাতেই অভি-জাতদের সন্তানদেরকে আইনের মৌল বিষয়গুলো শেখানো হতো। সাম্রাজ্য শাসনে ও রক্ষণে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে যুবরাজরা প্রশাসন বিষয়ে শিক্ষালাভ করতো। মধ্যযুগের ইউরোপে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ধর্মযাজকদের কবলে। পুরোহিতবিদ্যা, প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শন ছিল শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু। মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল যারা মিশনারীতে যাবে শুধু তাদের জন্যে। ছেলেরা অনেকেই তরবারি, বর্শা ও অশ্ব চালনায় উৎসাহী ছিল Knight হবার আশায়। পাদ্রীদের উদ্যোগেই ১১৫০ সালে প্যারিস, ১১৬০ সালে অক্সফোর্ড এবং ১২১৪ সালে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় (Universitus) প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসব শিক্ষালয়ে ধর্ম, প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শন ছিল শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু। বিজ্ঞানকে নিম্নবিত্তের শিক্ষার বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য করা হতো বলে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল না। সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে শিক্ষা ছিল উচ্চ ও বড়জোর মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নারী শিক্ষার প্রচলন বলতে [illegible] ছিল না।

(বাকি অংশ আগামীকাল)